৭

জার্মানি ও ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ

ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টটান্টদের বিরোধকে কেন্দ্র করে ভয়ানক একটি যুদ্ধ ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রথম দিকে এই যুদ্ধটি খ্রিস্ট ধর্মের দু'টো সম্প্রদায়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে বোহেমিয়ায় শুরু হলেও তা কালক্রমে ইউরোপের তৎকালীন ছোট বড় প্রায় সকল রাজ্য ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এই ইউনিটে ইতিহাসে স্মরণীয় উক্ত ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের কারণ, বিস্তার, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের কারণ
- পাঠ - ২ : ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি ও ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল

পাঠ - ১

ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পটভূমি

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ ১৬১৮-১৬৪৮ খ্রি: দীর্ঘমেয়াদি সংঘটিত একটি অনুক্রমিক যুদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ধর্মই এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিলো তা নয়, বরং ধর্ম এবং রাজনীতি উভয় কারণে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক উভয়েই তাদের নিজস্ব শক্তি বজায় রেখে এগিয়ে যেতে থাকে।

১। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের কারণ

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের কারণ হিসেবে প্রধানত ধর্মীয় অসন্তোষকেই চিহ্নিত করা হয়। এই যুদ্ধ প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের পারস্পরিক বিবাদের ফলে সংগটিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে জার্মানি ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ই চরম অনমনীয় ও আপোষহীন মনোভাব পোষণ করে এবং আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় যুদ্ধে বা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো। ১৫৫৫ সালে সম্পাদিত আগর্সবার্গের চুক্তি রোমান সাম্রাজ্যের অমীমাংসিত ইস্যুসমূহের সম্মানজনক মীমাংসা করতে পারেনি।

প্রথমত, এই শান্তিচুক্তি কেবলমাত্র ক্যাথলিক এবং লুথারবাদীদের স্বীকৃতি দিলেও ক্যালভিনপন্থীদের স্বীকৃতি দেয়নি। অথচ ১৬ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র ইউরোপে ক্যালভিনপন্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়ত, "এক্লেসিয়াসটিক্যাল রিজারভেশন" নীতি গ্রহণের মাধ্যমে চার্চের সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার যে নীতি প্রোটেস্টান্টরা সর্বত্র অগ্রাহ্য করে। দুপক্ষই এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত, এই শান্তি চুক্তিটি "রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম" নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো। অর্থাৎ ইউরোপের রাজারা যে ধর্মাবলম্বী হবেন প্রজারাও হবে সেই ধর্মের অনুসারী। যে সব রাষ্ট্রে প্রোটেস্টান্ট রাজা শাসন করতো লুথারবাদ সেই এলাকার রাষ্টীয় বা জাতীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, আবার ক্যাথলিক রাজ্য শাসিত অঞ্চলে ক্যাথলিক ধর্ম স্বীকৃতি পায়। এই নীতির সুবাদে রাজারা তাদের ভিন্নধর্মী প্রজাদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পায়। ক্যাথলিক রাজাগণের অধীনে প্রোটেস্টান্টগণ এবং প্রোটেস্টান্ট রাজাগণের

অধীনে ক্যাথলিকগণ অত্যাচারিত হতে থাকে। এই নির্যাতন ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে।

এভাবে জার্মানি আর্গসবার্গ চুক্তির পর থেকেই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। ধর্মীয় আন্দোলন জনজীবনে নতুন যুগের সম্ভাবনাকে খুলে দেবার পরিবর্তে জার্মানিতে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রট্টপের অন্ত:কলহ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। জার্মানি এই সময় ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যালভিনিস্ট তিনটি পরস্পর বিবাদমান ধর্মালম্বী গ্রট্টপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে শুধু ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যেই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিলো না, বরং প্রোটেস্টান্ট গ্রুপসমূহের মধ্যে অর্ন দ্বন্দ্ব এবং বিরোধও ছিলো তুঙ্গে।

জার্মানির উত্তরাংশ ছিলো সম্পূর্ণভাবে প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী। ১৫৫৫ সালের চুক্তি লুথারপন্থীদের স্বীকৃতি দেয়া হলেও ক্যালভিনপন্থীদের তা দেয়া হয়নি। তবে সমগ্র ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্যালভিনবাদ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ক্যালভিনবাদীরা নব্য জার্মানির বোহেমিয়ায়, রাইনল্যান্ড দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানি এমনকি ফ্রান্সেও (হিউগিনেট) ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এই দুই দলের পরস্পর দ্বন্দ্বের সুযোগে ক্যাথলিকপন্থীরা নিজেদের রক্ষা এবং শক্তি সঞ্চয়ের পথ বেছে নিয়েছিলো।

প্রতিসংস্কার আন্দোলন শুরু হলে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীগণ বিশেষত জেসুইটরা ক্যাথলিকবাদ প্রচার করতে থাকে। দক্ষিণ জার্মানি, ব্যাভারিয়া, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ এবং রাইনে ক্যাথলিক ধর্ম পুন প্রতিষ্ঠা পায়।

"এক্লেসিয়াসটিক্যাল রিজারভেশন" নামে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তাও ধর্ম ভিত্তিক বিদ্বেষের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর শর্তানুযায়ী বিশপসহ যারা স্বেচ্ছায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের পদবিসহ ক্যাথলিক চার্চের সকল সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং উক্ত সম্পত্তি চার্চের অধীনে থাকবে বলে নিয়ম করা হয়। তবে এই নীতি লুথারপন্থীরা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পঞ্চম চার্লস চার্চের জমিকে নিরপেক্ষ করার বিরুদ্ধে ডিক্রি দেন। এর ফলে উভয় দলেই প্রচন্ড বিদ্বেষ এবং অস্থিরতা দেখা দেয়।

ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটি জটিল রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। উল্লেখ্য ধর্মীয় কারণে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হলেও এর পিছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল বলা যায়। ধর্ম বিষয়ে দুইটি পরস্পর বিরোধী বিভক্তি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করে। পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফার্ডিনান্দ এই দ্বন্দ্বের সুযোগে জার্মানিতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। আবার সুইডেনের রাজা গাস্টাভাস নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং বাল্টিকে সুইডেনের প্রভাব বিস্তার ও ইউরোপে প্রোটেস্টান্টদের রক্ষা করার নামে যুদ্ধে যোগদান করেন। অপরদিকে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রিশল্যু স্পেন ও অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গের প্রাধান্য খর্ব করার উদ্দেশ্য এই যুদ্ধে যোগদান করেন।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য রাজন্যবর্গের নেতৃত্বে দুটি পরস্পর বিরোধী জোটে বিভক্ত হয়ে পড়লে যে কোনো মুহূর্তে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। ১৬০৮ সালে

প্রোটেস্ট্যান্টরা একটি ইভানজেলিক ইউনিয়ন বা প্রোটেস্টান্ট ইউনিয়ন গঠন করে। এটি হয়েছিলো প্যালাটিনেট এবং ক্যালভিনিস্ট রাজকুমার ফ্রেডারিখের নেতৃত্বে। এর বিরুদ্ধে ১৬০৯ সালে ক্যাথলিকরাও পবিত্র সংঘ বা হোলি লীগ নামে অনুরূপ একটি সংঘ স্থাপন করে। ব্যাভারিয়ার ম্যাক্সিমিলানের নেতৃত্বে যুদ্ধংদেহী জোট গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানিতে দ্বন্দ্ব অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠে।

প্রোটেস্টান্টরা অভিযোগ করে যে চার্চ তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছিল। যেহেতু ক্যালভিনিস্টদের কোনো ধর্মীয় মর্যাদা ছিলো না তাই তারা সোচ্চার হয়ে উঠে। ফলে জার্মানিতে ধর্মীয় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দিতে ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মীয় দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো। ১৫৪০ সাল থেকেই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে সংঘাত চলে আসছিলো। ধর্মের নামে যুদ্ধ ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, হল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফ্রান্সে প্রোটেস্টান্টবাদী ক্যালভিনরা হিউগিনট নামে পরিচিত ছিল। ১৫৭২ সালে বার্থলোমিউর দিনে (২৪শে আগস্ট) সকল হিউগিনেট নেতা এবং হাজার হাজার প্রোটেস্টান্টকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সমগ্র ইউরোপে হিউগিনদের বিরুদ্ধে হত্যাকান্ড ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশী নেদারল্যান্ড প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয়।

এ ছাড়াও প্রোটেস্টান্ট হল্যান্ড এবং স্পেনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৫৮৮ সালে স্পেনিশ আর্মাডার পতনের পর ইউরোপে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারীদেশ হিসেবে ইংল্যান্ড আবির্ভূত হয়। জার্মানিতে দ্বিতীয় রুডলফের পর প্রোটেস্ট্যান্টদের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। ক্যাথলিকরা আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জার্মান ডায়েট বা বিধায়ক সভায় প্রোটেস্টান্ট বিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দ্বিতীয় রুডলফের পর ফার্ডিনান্ড বোহেমিয়া আক্রমণ করলে ত্রিশবছর ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়।

মূলত অনৈতিকতা সেই যুগটিকে গ্রাস করেছিলো। সাংস্কৃতিক রীতি, নীতি, নৈতিক দৃঢ়তা, আচার আচরণ, নীতিশাস্ত্র ক্রমশ নিম্নমুখী হতে শুরু করে। রাস্তাঘাটে ডাকাতি, নরহত্যা, খুন জখম ইত্যাদি ছিলো নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। রেনেসাঁস বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন নৈতিক অধপতন, নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতাকে মুছে ফেলতে পারে নি। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতারাও ধর্ম গ্রন্থের বাইরে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারতো না। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ততোটা অগ্রসর ছিল না। ধর্মীয় আলোচনাগুলো ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। এভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ, অনৈতিকতা এই যুগটিকে ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অসহিষ্ণু করে তোলে। যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে এ সবকেই চিহ্নিত করা হয়।

যুদ্ধের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়

প্রথমত, এটি বোহেমিয়ার একটি স্থানীয় দ্বন্দ্ব থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ জার্মানিতে বিস্তার লাভ করে। সেখানে থেকে ডেনমার্ক হয়ে ক্রমশ সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এভাবে সমগ্র ইউরোপকে যুদ্ধের আর্বতে ঢেকে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ ছিলো মূলত প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক দ্বন্দ্ব।

তৃতীয়ত, এটি ছিলো হ্যাপসবার্গ এবং বুরবোঁ এই দুই রাজ বংশের ইউরোপীয় রাজনীতিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। সুতরাং ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধকে কেবলমাত্র ধর্মযুদ্ধ মনে করা ঠিক হবে না।

২। ত্রিশবছর ব্যাপী যুদ্ধের পর্বসমূহ

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল-

১। বোহেমিয়া বা প্যালাটিনেট পর্ব; ২। ডেনিশ পর্ব ৩। সুইডিশ পর্ব এবং ৪। ফরাসি পর্ব। এই

বোহেমিয়া বিদ্রোহ বা বোহেমিয়া-প্যালেটিনেট পর্যায়

ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের নিকটবর্তী কারণ ছিলো বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগের বিদ্রোহ। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট রুডলফের সঙ্গে তাঁর ভাই ম্যাথিয়াসেব দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বোহেমিয়াবাসী ১৬০৯ সালে প্রোটেস্টান্টদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছিলো। ১৬০৯ সালে রুডলফ বোহেমিয়ানদের একটি রাজকীয় চার্টার বা অধিকার সনদ (ম্যাজেসটাট্সব্রিশ) প্রদান করেন। এতে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সম্প্রাদায়গুলি ক্যাথলিকদের সমপর্যায়ভুক্ত ধর্মীয় অধিকারসমূহ প্রাপ্ত হয়। রুডলফের উত্তরাধিকারী ম্যাথিয়ুসকে তিনি সম্রাট হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন (১৬১২)। মাথিয়াস (১৬১২) চার্টারে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ খর্ব করতে উদ্যত হলে প্রোটেস্টান্টরা প্রতিজ্ঞা করে যে এই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর এমন কাউকে রাজা নিয়োগ করা হবে যিনি প্রোটেস্টান্টদের প্রতি সহানুভুতি সম্পন্ন হবেন। ১৬১৯ সালে সম্রাট ম্যাথিয়াস মারা যাবার আগে ফার্ডিনান্ড স্টিরিয়াকে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান। কিন্তু তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক।

দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েই প্রাগে প্রোটেস্টান্ট চার্চ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। চার্চের ধ্বংসযজ্ঞ বোহেমিয়ার প্রোটেস্টান্ট এবং চেক অভিজাতবর্গের মধ্যে জাতীর চেতনা সৃষ্টি করে। প্রোটেস্টান্টরা সম্রাটের কাছে এর প্রতিকারের জন্য আবেদন করে। তবে সম্রাটের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অভিজাত শ্রেণী ছিলেন ক্যালভিনিস্ট পন্থার। তারা প্রাগের রাজ প্রাসাদে গমন করেন। সেখানে সম্রাটের অফিসারদের একটি কনফারেন্স বা সম্মেলন কক্ষে ঢুকে তাদেরকে অবরোধ করে এবং পুরানো বোহেমীয় রীতি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী দুর্গের জানালা দিয়ে রাজ প্রতিনিধিদের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ফুট নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এভাবে রাজপ্রতিনিধিদের ছুঁড়ে ফেলার মতো ঘটনার মধ্যদিয়ে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ১৬১৯ সালে বোহেমিয়ার সংসদ মিলিত হয় এবং ফার্ডিনান্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তারা ঘোষণা দেয় যে ফার্ডিনান্ড এখন থেকে বোহেমিয়ার আর রাজা নন, বরং তারা একজন নতুন রাজা মনোনীত করবেন।

বোহেমিয়ার সংসদ প্যালাটিনেটের ইলেকটর এবং জার্মান ক্যালভিনিস্ট নেতা ফ্রেডারিখকে (ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের কন্যা এলিজাবেথের জামাতা) নতুন রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাজসিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। ফার্ডিন্যান্ড যখন জানলেন যে বোহেমিয়াবাসী প্রজারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং রাজসিংহাসন একজন ক্যালভিনিস্টপন্থী ইলেকটর ফ্রেডারিখের হাতে অর্পণ করা হয়েছে তখন তিনি রাগান্বিত হন এবং এই বিদ্রোহী প্রজাদের শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ফার্ডিনান্ড বোহেমিয়া থেকে ফ্রেডারিখকে উৎখাত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

যুদ্ধে ফার্ডিনান্ড এবং ফ্রেডারিখ উভয়েই নিজ নিজ অবস্থান বজায় রাখেন। বিভিন্ন রুটিবিচ্যুতির পরও প্রোটেস্টান্ট গ্রুপগুলি আশা করেছিল ইংল্যান্ড এই অবস্থায় প্রোটেস্টান্ট পক্ষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু জেমস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। তিনি স্বীয় রাজবংশের সম্মান রক্ষার্থে তার পুত্রের সঙ্গে স্পেনের রাজকন্যা ইফানটার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও ফ্রেডারিখ জার্মানির লুথারবাদী রাজন্যবর্গের কাছ থেকে সাহায্য আশা করেছিলেন। তবে যখন এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, ইংল্যান্ড জার্মানিতে হস্তক্ষেপ করবে না তখন লুথারবাদী রাজন্যবর্গ নিজেদের নিরপেক্ষ রাখার কথা ঘোষণা করে।

অপরদিকে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড তাঁর জ্ঞাতি ভাই দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে স্পেনের সৈন্য বাহিনীর সহায়তায় প্যালাটিনেট আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বাভারিয়ার ম্যাক্সিমিলান ও অস্ট্রিয়া বাহিনীর সহায়তায় বোহেমিয়া আক্রমণে এগিয়ে আসেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জ্যানসার ক্লেস এবং ব্যারন ভন টিলি। ফ্রেডারিখ আক্রমন্তক নীতি গ্রহণ করেন এবং ট্রান্সসেলভানিয়ার বিদ্রোহী রাজকুমার বেথলেন ক্যাবর এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভিয়েনা অভিমুখে ছুটতে থাকেন (ডিসেম্বর ১৬১৯)। প্রাগের অদূরে মাউন্টেনের যুদ্ধে ব্যারন ভন টিলী ফ্রেডারিখের বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং যুদ্ধে ফ্রেডারিখের বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা হয়। ফ্রেডারিখ নিরাপত্তার জন্য প্রথমে হেগে, পরে ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ডকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ক্যাথলিকরা তাদের বিজয়ে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে রাইন অঞ্চলসহ জার্মানির প্রায় সকল অঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে।

এই বিজয়ের পর সমগ্র জার্মানিতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৬১৯ - ১৬২৯ মধ্যে অস্ট্রো - ক্যাথলিক শক্তি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করতে থাকে। সম্রাটের সহযোগিতায় ম্যাক্সিমিলানকে ব্যাভারিয়ার অধীনে নিয়ে আসেন এবং তাকে ইলেক্টর পদে অধিষ্ঠিত করান। এভাবে ক্যাথলিক শক্তি ক্রমশ উর্ধ্বগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়াও ১৬০৯ সালে ডাচ এবং স্পেন তাদের পূর্বেকার দীর্ঘ যুদ্ধকে স্থগিত করে বারো বছরের মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করে।

দ্বিতীয় পর্যায় : ডেনিশপর্ব

ফ্রেডারিখের পরাজয়ে ইংল্যান্ডের প্রথম জেমস এবং ইউরোপের প্রোটেস্টান্ট রার্জন্যবর্গ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। জেমস তার জামাতা ফ্রেডারিখকে পুনরায় প্যালটিনেটের ইলেকটর করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এটি ভিন্ন জার্মানির লুথারবাদীরাও প্রথম পর্বের এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ নীতি

গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় চিন্তা শুরু করেন কিভাবে প্রোটেস্টান্টদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়।

জার্মান রাজন্যবর্গ প্রথম পর্যায়ের বোহেমিয়ার দ্বন্দ্ব বা সংঘাত থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলেও এই যুদ্ধে জার্মানির অনৈক্যের মধ্যে প্রোটেস্টান্ট রাজকুমাররা এগিয়ে আসেন। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ঐক্যবদ্ধহীন জার্মান রাজন্যবর্গ একত্রিত হয়। অপরদিকে ক্যাথলিক লীগের সমর্থন নিয়ে ফার্ডিনান্ড এগিয়ে যেতে থাকেন। ক্যাথলিকদের পিছনে ক্যাথলিক, স্যাক্সনির ইলেকটর, আর্চবিশপ আলবার্ট এবং স্পেনের রাজা ঐক্যবদ্ধ হন।

ডেনিশরা জার্মানি আক্রমন করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যেহেতু ইংল্যান্ড জড়িয়ে যায় তাই এই যুদ্ধে জেনারেল টিলি পরাজিত হবেন এটিই ভাবা হয়েছিলো। সম্রাটের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তাঁর পক্ষে নতুন সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য তার ভাল বলা যায়। এই সময় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য তখন অন্য জায়গা থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই সময় এ্যালবার্ট ভন ওয়েলেনস্টিন সম্রাটকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব দেন। সম্রাট তার তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে এটিকে ঈশ্বরের আশীবাদ বলে মনে করেন। ডিউক অব ওয়েলেনস্টিন ছিলেন বোহেমিয়ার চেক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। ইউরোপের সকল অঞ্চল থেকে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেয় ইতালি, সুইস, স্পেন, জার্মান, পোল, ইংরেজ, স্কট প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকরা। ১৬২৫ সালের মধ্যেই ওয়েলেনস্টিন প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

এরই মধ্যে চতুর্থ খ্রিস্টান মধ্য জার্মানিতে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে তিনি টিলির বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করেন লুটারে ১৬২৬ সালে। লুটারে চতুর্থ খ্রিস্টান ওয়েলেনস্টিনের যৌথ বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলো। ওয়েলেনস্টিন বোহেমিয়া থেকে এলবা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং টিলির সঙ্গে একত্রিত হয়ে ম্যাকলেনবার্গ, পোমারনিয়া, সলসউইগ, জাটল্যান্ড দখল করে। ডেনমার্কের কিছু অংশ জয় করলে বাল্টিক এবং উত্তর সাগরে নৌবাণিজ্যের দুর্বলতায় তিনি সমগ্র ডেনমার্ক জয় করতে ব্যর্থ হন। ১৬২৯ সালে স্টলসান্ড নামক শহর আবরোধ করতে গিয়ে তিনি পরাজিত হন এবং ডেনমার্ক ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হন। ওয়েলেনস্টিন এবং খ্রিস্টান এর মধ্যে ১৬২৬ সালের শেষে ল্যুবক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অঞ্চলসমূহ ধরে রাখতে সক্ষম হলেও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে তার পরিবার কর্তৃক যেসমস্ত জার্মান বিশপারী অর্জিত হয়েছিলো তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে ডেনিশ পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

ডেনমার্কের পরাজয় ক্যাথলিক শক্তিকে নিরঙ্কুশ করে তুলেছিল। এখন আর সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ রইল না। সমসাময়িক সবাই ভাবতে শুরু করেন যে, প্রোটেস্টান্ট শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই বিজয়ের পর চতুর্থ ফার্ডিনান্ড প্রোটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে বিজয়ের আতিশয্যে রেস্টিটিউশন এডিক্ট নামে একটি নির্দেশ জারি করেন। এই আইন দ্বারা ১৫৫৫ সালের আগসবার্গের সন্ধির পর থেকে প্রোটেস্ট্যান্টরা যে সকল ক্যাথলিক গির্জার এবং অন্যান্য চার্চের অধীনে সম্পত্তি দখল করেছিলো তা আবার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়ে ছিল। এ ছাড়াও

এর মাধ্যমে ক্যাথলিকবাদী এবং লুথারবাদী ছাড়া অন্য ধর্মীয় গ্রুপ মতবাদকে নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন দ্বারা ক্যাথলিকবাদীরা ২টি আর্চবিশপারী, ১২টি বিশপারী, ৩০টি হ্যানশহর, ১২০টি মঠ এবং অন্যান্য চার্চের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেতে সক্ষম হয়। তবে এই এডিক্টের দুটি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি হলো ওয়েলেনস্টিনের অভাবনীয় সাফল্য। খ্রিস্টান জগত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এমন ভাবলেও যুদ্ধে দখলকৃত স্থানগুলিতে নৃশংস ও লুণ্ঠন তার বিরুদ্ধে যেতে থাকে। তাকে পদচ্যুত করা হয়, দ্বিতীয়ত; সুযোগ বুঝে গাস্টাভাস এডোলফাস প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে ফার্ডিনান্ড-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

গ) তৃতীয় পর্যায় : সুইডিশ পর্ব (১৬৩০ - ১৬৩৫)

এতদিন পর্যন্ত জার্মানিতে হ্যাপসবার্গের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অসন্তোষ কেবলমাত্র ক্যালভিনিস্টদের মধ্যেই বিরাজমান ছিলো। তবে এডিক্ট অব রেস্টিটিউশন- এর বাস্তব প্রয়োগ ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে সকল প্রোটেস্টান্টদের দাঁড়াবার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি লুথারবাদীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। এর পর লুথারবাদীরা ক্যালভিনিস্টদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নিজেদের বিবাদ ভুলে গিয়ে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে, সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই অবস্থাটিই উত্তরের প্রোটেস্ট্যান্ট দেশ সুইডেনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সুইডেনের রাজা গাস্টাভাস এডালফাস ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই যুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে কেবলমাত্র প্রোটেস্টান্ট ধর্মনীতির প্রতি ভালবাসা বা আনুগত্যই মূল কারণ ছিলো না। বলা যায় ধর্মের পাশাপাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই যুদ্ধে যোগদান করেন।

প্রথমত : পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব বলয় যদি জার্মানির উত্তর-উপকূলে পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় তবে এটি তাঁর নিজ দেশের অধীনস্থ অঞ্চলগুলির উপরও প্রভাব বলয় স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এই বিবেচনা থেকেই গাস্টাভাস সুইডেনকে ইউরোপের নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত : একজন গোঁড়া লুথারবাদী হিসেবে তিনি তাঁর জার্মান প্রোটেস্টান্ট অনুসারীদের সমর্থনে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন। এভাবে গাস্টাভাস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত প্রোটেস্টান্টদের মুক্তিদাতা বা চ্যাম্পিয়ান হিসেবে আবির্ভূত হন।

এই যুদ্ধে গাস্টাভাস ফরাসি মন্ত্রী রিশুল্যুর সমর্থন এবং যুদ্ধে ফ্রান্স কর্তৃক রসদও অর্থ সাহায্য লাভ করেন। রিশল্যু ক্যাথলিক হলেও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে প্রাটেস্টান্টদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ফ্রান্সের দিক থেকে সুইডেনকে সাহায্য করার পশ্চাতে মনোভাব ছিল মূলত হ্যাপসবার্গ- অস্ট্রিয়া স্পেনকে পরাজিত করতে পারলে বুরবোঁ রাজবংশ সবচাইতে বেশি লাভবান হবে এমন ধারণা।

সুইডিশ সৈন্যবাহিনী সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ১৬৩০ সারে জুলাই মাসে জার্মানিতে অবতরণ করে। এটি ছিল প্রথম আধুনিক জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল একটি সৈন্যবাহিনী।

ফ্রান্সের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে গাস্টাভাস ১৬৩০ সালে পোমারনিয়া উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি উত্তরের প্রধান দুর্গগুলো দখল করেন। পোমারনিয়ার পতন ঘটে, ব্রান্ডেনবার্গের ডিউক জর্জ উইলিয়াম তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। তবে এই সময় জার্মান রাজন্যবর্গ তাঁকে কোনো সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। কারণ তাদের ভয় ছিলো যে তাদের সাহায্য জার্মানিতে সুইডিশ আধিপত্য বিস্তার করবে। রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে পোমাবানিয়া উদ্ধার করে গাস্টাভাস ওডার পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ফাঙ্কফুর্ট গ্রহণ করে টিলি এবং ওয়েলেনস্টিন এর মিলিত জোটকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী তিনদিন অবরোধের পর এর সুরক্ষিত দুর্গ ম্যাগডেবার্গ দখল করে (২০শে মে ১৬৩১)। এই শহরের পতনের পর সমগ্র শহরে এক ধরনের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়, সমগ্র শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, এতে প্রায় বিশ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

ম্যাগডেবার্গের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গ তথা শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গ যারা এতদিন নিরপেক্ষ ছিলেন তারা গাস্টাভাসের পতাকা তলে সমাবেত হতে শুরু করেন। এভাবে স্যাক্সনি এবং ব্র্যান্ডেনবার্গ গাস্টাভাসের পক্ষে যোগদান করলে প্রোটেস্টান্ট শক্তি বৃদ্ধি পায়। উত্তরের সিংহ গাস্টাভাস এরপর আক্রমণ্ত্মক নীতি গ্রহণ করেন। ১৬৩১ সালে গাস্টাভাস ব্যান্ডেনবার্গ এবং স্যাক্সনির সঙ্গে একত্রিত হয়ে লিপজিগের কাছে ব্রাইটেনফিল্ডের যুদ্ধে টিলির বাহিনীকে সম্প র্ণভাবে পরাজিত করেন। বোহেমিয়া আক্রমণ এবং প্রাগ জয় করে গাস্টাভাস বিজয়ীর বেশে টুরিঙ্গানা এবং ফাঙ্কোনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। সমগ্র উত্তর এবং প্রোটেস্টান্ট জার্মানি আবার স্বাধীনভাবে নি:শ্বাস নিতে থাকে। দানিয়ুবের কাছে লেনজ নদীর সংগমস্থলে লেচফিল্ডের যুদ্ধে টিলির সৈন্যবাহিনী সম্প র্ণভাবে পরাজিত হয়। গাস্টাভাস এই বিজয়ের পর দানিয়ুব নদী অতিক্রম করেন। তিনি আগসবার্গ এবং মিউনিখ শহর দখল করে নেন। সম্রাটের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় এবং মনে হতে থাকে ভিয়েনার পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যুদ্ধে টিলির মৃত্যু এবং সুইডিশবাহিনী কর্তৃক মিউনিখ দখলের ঘটনায় শঙ্কিক হয়ে সম্রাট ওয়েলেনস্টিনকে ডাকতে বাধ্য হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওয়েলেনস্টিন এগিয়ে আসেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওয়েলেনস্টিন আবার পাঁচমিশালী সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং সুইডিশ সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এই দুই শ্রেষ্ঠ সমরবিদ মুখোমুখি হয়েছিলেন লিপজিগের অদূরে লুজনে ১৬৩২ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে। সারাদিনের ভয়াবহ এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ওয়েলনস্টিন তার সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন, সুইডিশদের বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে সুইডিশদের এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে। গাস্টাভাস যুদ্ধের ময়দানে তার অসামান্য সাহসিকতার প্রদর্শন করে যুদ্ধে নিহত হন।

তবে সুইডিশ সৈন্যবাহিনী তার অসমসাহসী নেতার মৃত্যুর পর দুর্বল হয়ে পড়লেও নাবালিকা রানী খ্রিস্টিনার অভিভাবক ও মন্ত্রী অক্সেনট্রিয়ানা প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। গাস্টাভাস হর্ন এবং গাস্টাভাস বার্ন এর নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও গাস্টাভাস এডালফাস সমতুল্য নেতা সুইডেন পাননি। সুইডেনে তাঁর মৃত্যুর ক্ষতি আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে গাস্টাভাসের মৃত্যুর পর হ্যাপসবার্গ সম্রাট বোহেমিয়ার রাজসিংহাসন দখল করতে ওয়েলেনস্টিন উৎসাহী এমন সন্দেহে ১৬৩৪ সালে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড ঈর্ষা এবং সন্দেহ প্রবণ হয়ে সর্বোচ্চ সেনানায়কের পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেন। এ্যাগার নামক স্থানে যাবার পথে কাপ্তেন জেফোরসনের পরিচালনায় সম্রাটের নিদের্শে তাকে হত্যা করা হয়।

গাস্টাভাসের মৃত্যুর পর যুদ্ধ শেষ হবার সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি মূলত ফরাসিরা তাদের স্বার্থে বা অনুকূলে কোনো অর্জন ব্যতীত যুদ্ধ বন্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলো না বলে। তবে বসন্তে নউলিং জনের যুদ্ধে হ্যাপসবার্গ বাহিনী সুইডেনকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে এবং সুইডিসবাহিনী হ্যাপসবার্গের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে সম্মত হয়। অপরদিকে গাস্টাভাসের মৃত্যু, ওয়েলেনস্টিনের পদচ্যুতি, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষয়, প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গ এমনকি ক্যাথলিক সম্রাটও এই সময় শান্তিচুক্তি স্থাপনে ইচ্ছা পোষণ করে। এই অবস্থায় তৃতীয় বা সুইডিশ পর্বের সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ১৬৩৫ সালে প্রাগে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সকল রাজন্যবর্গ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। দুর্গগুলি আগের মতই আরো চল্লিশবছর প্রোটেস্টান্টদের অধিকারে থাকবে বলে আগসবার্গের চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চতুর্থ পর্ব : ফরাসি পর্যায় (১৬৩৬ - ১৬৪৮)

প্রাগের শান্তিচুক্তির পর মনে হয়েছিলো যে এটি জার্মান যুদ্ধের এটি সম্মানজনক সমাধান এনে দিয়েছে। সবাই ভেবেছিলো যুদ্ধ হয়তোবা শেষ হয়ে গেছে এবং এতদিনপর জার্মান ভূখন্ডে শান্তি ফিরে আসবে। তবে প্রাগের শান্তিচুক্তি জার্মানিতে শান্তি ফিরিয়ে আনলেও এটি প্রোটেস্টান্ট জার্মানির রাজন্যবর্গের অসন্তোষ অর্জন করে এবং ফ্রান্সের কার্ডিনাল রিশল্যু এই চুক্তি মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ফ্রান্সের এসময়কার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো স্পেন অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গকে ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা। রিশল্যু নিজ দেশে ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মানিষ্ঠানের কার্ডিনাল। তিনি দেশের অভ্যন্তরে ক্যাথলিক এবং বিদেশে প্রোটেস্টান্ট এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তবে প্রাগের চুক্তির পর তিনি কোথাও হ্যাপসবার্গ শক্তির পতনের সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মূলত নউলিংজেনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর প্রোটেস্টান্ট পক্ষ দুর্বল হয়ে গেলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিফল হতে বসেছে দেখে ফরাসিরাজ ত্রয়োদশ লুই তাঁর মন্ত্রী রিশল্যু প্রোটেস্ট্যান্ট পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন মনে হচিছল রিশল্যু হ্যাপসবার্গের ক্ষমতাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসেন। এভাবে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ প্রধানত বুরবোঁ এবং হ্যাপসবার্গ পরিবারের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

১৬৩৫ সালে রিশল্যু প্রকাশ্যেই জার্মান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একদিকে ফরাসি এবং সুইডিশরা এবং অন্যদিকে আস্ট্রিয়াও স্পেনিশরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো যা আরো তেরো বছর পর্যন্ত চলে। ফ্রান্স এবং তার মৈত্রী জোটে সুইডেন ডাচ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েও প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। স্পেনীয় বাহিনী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো, তাদের যোগ্য জেনারেলদের মধ্যে ছিলো ইতালিয়ান প্রিন্স পিকোলমিনি। ১৬৩৬ সালে বিশাল স্পেনীশ সৈন্য বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করে এবং প্রায়

প্যারিস দখল করার মত অবস্থা তৈরি হয়। ১৬৩৭ সালে আরেকটি স্পেনীশ বাহিনী পিরেনিজ পার হয় এবং দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ করে। ফ্রান্স সর্বক্ষেত্রে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে থাকে। কিন্তু ১৬৪০ সালের পর স্পেনিশরা পিছু হটতে থাকে, ফরাসিরা অগ্রসর হতে থাকে।

ফরাসি সৈন্যবাহিনী বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, কমটি, উত্তর ইতালি এবং স্পেন আক্রমণ করে। এর ফলে স্পেনিশ রাজা হল্যান্ডের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের আক্রমণাত্নক নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং প্রোটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন। অপরদিকে রিশুল্যু সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং নতুন সৈন্য নিয়োগ করে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী করে গড়ে তোলেন। ডাচরা হল্যান্ডে স্পেনের শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ফরাসিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্পেনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত স্পেনীয়দের বিপুল শক্তি ক্ষয় করে এবং ১৬৪০ সালের বিদ্রোহ থেকে বোঝা যায় যে স্পেনের পরাজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৬৪২ সালে রিশল্যু মারা গেলেও তার উত্তরাধিকারী কার্ডিনাল ম্যাজারিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ফরাসি সৈনাধ্যক্ষ তুরিন এবং কান্ডির সমরকুশলাতায় রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে ফরাসি বাহিনী অবলীলা ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল। তারা স্পেন অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত ক্যাথলিক বাহিনীকে পরাজিত করতে লাগলেন। প্রিন্স নডির সামরিক শ্রেষ্ঠত্বে রকরয়ের যুদ্ধে ১৬৪৩ সালে ফরাসিরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে এবং এই বিজয় শতাব্দীকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

নডি এবং তুরিন এর কাছে এরপর সব যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজয় স্বীকার করে নেয়। জার্মানিতে অস্ট্রিয়ান হ্যাপসবার্গরাও স্পেনের ভাগ্য বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। তবে এই সময় হ্যাপসবার্গ সম্রাট ব্যাভারিয়ায় ম্যাক্সিমিলান এবং অন্যান্য ক্যাথলিক রাজন্যবর্গের সাহায্যার্থে প্রোটেস্টান্ট জার্মানি এবং সুইডিশদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উপসাগর অঞ্চলে সুইডেন এবং প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর অস্ট্রিয়ান সম্রাট বুঝতে সক্ষম হন যে এই যুদ্ধে জয় লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র তৃতীয় ফার্ডিনান্ড সম্রাট পদ লাভ করেন। ১৬৪৬ সালে তুরিন ম্যাক্সিমিলান অব ব্যাভারিয়াকে পরাজিত করলে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্কেত বেজে উঠে। তুরিন কর্তৃক ব্যাভারিয়া দখল নির্দেশ করে যে তাঁর অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গের প্রতিরোধ তিনি ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হবেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে পবিত্র রোমান সম্রাট যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে রাজি হন। একটি সমঝোতা গঠন করার লক্ষ্যে কংগ্রেস আহবান করা হয় মুনস্টার এবং ওসনামব্রুকে। এভাবে মুনস্টার এবং ওসনামব্রুকে ১৬৪৮ সালে কিছু পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি হয়েছিলো একদিকে ফ্রান্স তার মিত্রসমূহ এবং অপরদিকে স্পেন ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে পরিস্থিতির চাপে পড়ে ফার্ডিনান্ড ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করে এই যুদ্ধের অবসান ঘটান। তবে স্পেন এই সন্ধিতে যোগদান করে ও পরবর্তী আরো এগার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ১৫৫৯ খ্রিঃ পিরেনিজেব সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

সারসংক্ষেপ

ইউরোপে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধের সর্বশেষ উদাহরণ হলো ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ। প্রোটেস্টান্ট বিদ্রোহের পরপরই সমগ্র ইউরোপে ধর্মবিদ্বেষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব শুরু হয় তেমনি বিভিন্ন প্রোটেস্টান্ট গ্রুপগুলোর মধ্যেও তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে সমগ্র ইউরোপে ধর্মীয় উন্মত্ততা বাড়তে থাকে। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নিজ স্বার্থোদ্ধারে যখন এই যুদ্ধে যোগদান করেন তখন নি:সন্দেহে বলা যায় যে যুদ্ধের কারণ ধর্ম থেকে রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাগের একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূলত নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কারণে নিজ নিজ অবস্থান সংহত রেখে ইউরোপীয় রাজারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। প্রোটেস্টান্ট জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ান হ্যাপসবার্গের-এর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখা, ডেনমার্কের রাজার উচ্চভিলাষ, বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার এবং হ্যাপসবার্গকে পরাজিত করে ফ্রান্সকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা এসব নিয়েই যুদ্ধ প্রলম্বিত হতে থাকে। ফান্সের কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল কার্ডিনাল রিশুল্যুর এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অন্যতম নীতি। ধর্মান্ধতা, স্বার্থপরতা, নিজেদের উচ্চাকাংক্ষা এবং প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইউরোপের সকল দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ত্রিশবছর ধরে যুদ্ধে সমগ্র জার্মানি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আগসবার্গের চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?

ক) ১৫৫৯ সালে
খ) ১৫৫৩ সালে
গ) ১৫৫৫ সালে
ঘ) ১৫৫৭ সালে

২। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিলো

ক) জার্মানির লোরেন অঞ্চলের বিদ্রোহ
খ) পবিত্র রোমান সম্রাটের মৃত্যু
গ) ধর্ম ভিত্তিক বিদ্বেষ
ঘ) বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগের বিদ্রোহ।

৩। বোহেমিয়ার সংসদ কাকে বোহেমিয়ার রাজা হিসেবে মনোনীত করে?

ক) প্যালাটিনের ইলেকটর ফ্রেডারিখ
খ) স্যাভয়ের ডিউক জনক্যাসেল
গ) স্যাক্সনির ডিউক জন জর্জকে
ঘ) ব্রাডেনবার্গের ডিউক জর্জ উইলিয়াম

৪। ডিউক অব ওয়েলেনস্টিন কোন জাতিভুক্ত ছিলেন ?

ক) পোলিশ
খ) জার্মান
গ) স্পেনীশ
ঘ) চেক

৫। গাস্টাভাস কোন সাগরকে সুইডিশ লেকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন?

ক) আড্রিয়াটিক সাগর
খ) বাল্টিক সাগর
গ) ভূমধ্যসাগর
ঘ) ক্যাস্পিয়ান সাগর

৬। কোন দুর্গের পতনের পর জার্মানির রাজন্যবর্গ গাস্টাভাস-এর দিকে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয়?

ক) ম্যাগডেবার্গ
খ) স্যারিল
গ) হোহেনজোলার্ন
ঘ) স্যাভয়

৭। কোন যুদ্ধে গাস্টাভাস টিলির সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন?

ক) ল্যুবকের
খ) ব্রাইটেনফিল্ডের যুদ্ধ
গ) উইটেনফিল্ডের যুদ্ধে
ঘ) পোমারনিয়ার যুদ্ধে

৮। কোন যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে গাস্টাভাস মৃত্যুবরণ করেন?

ক) ল্যুবকের যুদ্ধ
খ) বোহেমিয়ার যুদ্ধ
গ) স্যাভয়ের যুদ্ধ
ঘ) লুজনের যুদ্ধ

৯। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির মূল রূপকার কে ছিলেন?

ক) কার্ডিনাল রিশল্যু　　খ) কার্ডনাল ম্যাজারিন
গ) কার্ডিনাল সালি　　ঘ) কার্ডিনাল কোলবেয়ার

১০। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?

ক) ১৬৪২ সালে　　খ) ১৬৪৪ সালে
গ) ১৬৪৬ সালে　　ঘ) ১৬৪৮ সালে

উত্তর : ১। (গ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (খ), ৫। (খ), ৬। (ক), ৭। (খ), ৮। (ঘ), ৯। (ক), ১০। (ঘ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের ধর্মীয় কারণ সংক্ষেপে লিখুন।
২। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বোহেমিয়ার বিদ্রোহ কীভাবে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করে। ফ্রেডারিখের পরাজয়ের মূল কারণ গুলি চিহ্নিত করুন।
২। ডেনিশ রাজা খ্রিস্টান এর ব্যর্থতাসমূহ চিহ্নিত করুন। এডিক্ট অব রেস্টোটিউশন কেন প্রবর্তন করা হয়? এর প্রভাব কি ছিল?
৩। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে গাস্টাভাসের মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো? গাস্টাভাসের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
৪। রিশল্যুর পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি স্বাক্ষরের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization, Vol II, (From 1600 to the Present)
২। Carlton J. H. Hayes, Modern Europe to 1870
৩। Robert Ergong, Europe from the Renaissance to Waterloo.
৪। B. V. Rao, History of Europe (1450 - 1815)
৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)।

পাঠ - ২

ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি ও ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- এই সন্ধির রাজনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ত্রিশবছর ব্যাপী যুদ্ধের ফলাফর সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পটভূমি

ইউরোপের ইতিহাসে ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইউরোপের প্রথম শান্তি সম্মেলন ছিল এটি। ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধি এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন গতিধারা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা করে।

১৬৪১ সালে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড (১৬৩৭ সালে যিনি অস্ট্রিয়ার রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন) শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করেন। তবে ১৬৪৬ সালে কার্ডিনাল রিশল্যুর মৃত্যুর পর এবং ১৬৪৬ সালে ফ্রান্স কর্তৃক ব্যাভারিয়া হস্তগত হবার পর প্রকৃত পক্ষে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুইডেনের রানী ক্রিস্টিনাও তার প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেন। ফ্রান্সের কার্ডিনাল ম্যাডরয়িনও এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তবে বিভিন্ন জটিল ইস্যু থাকার কারণে এবং বিভিন্ন কার্যপ্রণালীতে বিবাদ বিসংবাদ ও মতদ্বৈততার জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই আলোচনার সময় যেহেতু যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ ছিলো না। তাই ধ্বংস ও মৃত্যু তখনো চলতে থাকে। তবে অবশেষে সকল দেশের প্রতিনিধিরা ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়াতে মিলিত হয়ে দুটি ভিন্ন শান্তিচুক্তি পাস করে, একটি মুনস্টারে হ্যাপসবাস এবং ফ্রান্স এর মধ্যে এবং অপরটি ওসনা ব্রুকের এই দুই সন্ধিদ্বয়কে একত্রে সন্নিবিষ্ট করে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (২৪শে অক্টোবর ১৬৪৮)। এই চুক্তির ফলে দীর্ঘ ত্রিশবছরব্যাপী ধর্মজনিত কারণের ফলে সৃষ্ট যুদ্ধের অবসান ঘটে।

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি ইউরোপের শান্তির স্বপক্ষে প্রথম এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত রাষ্ট্রীয় উন্মাদনা, দ্বন্দ্ব পদক্ষেপ। এটি ধর্মীয় বন্ধ করে। এটি পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠন করে এবং আঞ্চলিক আগ্রাসনের লক্ষ্যে বংশগত রাজশক্তির প্রভাব, অথনৈতিক প্রতিযোগিতাকে ত্বরান্বিত করে। ইউরোপের আঞ্চলিক সীমানাসমূহ পুন:র্গঠন করার লক্ষ্যে এই চুক্তির পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও এটি ইউরোপকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই সন্ধির ভূ-খন্ডগত সীমানা নেপোলিয়নের যুগ পর্যন্ত বহাল থাকে।

২। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির শর্তসমূহ

১। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে সবচাইতে বড় পরিবর্তন হয় জার্মানিতে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের যে একক ভৌগলিক অস্তিত্ব বা সত্ত্বা ছিলো তা ভেঙ্গে যায় এবং জার্মানির প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর ফলে জামার্ন রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত হয়। পবিত্র রোমান সম্রাট শুধু নামমাত্রই টিকেছিলেন। হ্যাপসবার্গদের ক্ষমতা নিজস্ব বংশগত বা রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিসূত্রে অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর নীতিসমূহ অস্ট্রিয়া কেন্দ্রিক হতে থাকে।

২। ফ্রান্স এবং সুইডেন পবিত্র রোমান অঞ্চলে নতুন ভূমিকা লাভ করায় জার্মানির ব্যবস্থাপক সভায় ভোট দেবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

৩। ইউরোপের দুটি দেশ হল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিজয়ী শক্তির দীর্ঘ বিতর্কের পর ইউরোপের বহু রাজ বংশ। এই যুদ্ধে তাদের দাবিকৃত ভূমি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

৪। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে মারফত ফ্রান্সের অর্জন ছিলো সবচাইতে বেশি। ফ্রান্স মেৎজ, টুল ও ভার্দুন নামক তিনটি ধর্মানিষ্ঠান লাভ করে। তা ছাড়া ব্রাইসাক, ময়েনভিক এবং পিনেরোলা নামক তিনটি দুর্গ, ফিলিপবার্গ নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপনের অধিকার এবং অ্যালস্যাস নামক স্থানের অধিকাংশ দখল পায় আলসেশিয়ার দশটি শহরের উপর ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।

৫। সুইডেনকে পশ্চিম পোমারনিয়া এবং উত্তর সাগরের প্রতিবেশি অঞ্চল যেমন ব্রিমেন, ভার্দেন ইত্যাদি স্থান দেয়া হয়।

৬। ব্রান্ডেনবার্গ কেমিন, ম্যাগডেবার্গ, বাবস্ট্যাডেট এবং পূর্ব পোমারনিয়া লাভ করে। পশ্চিম পোমারনিয়া না পাওয়ার জন্য ব্রান্ডেবার্গকে ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়।

৭। প্যালাটিনেটের সমস্যা সমাধানের ব্যাভারিয়া এবং প্যালাটিনেটকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। দুই অংশ ব্যাভারিয়ার ম্যাক্সিমিলান এবং ফ্রেডারিকের ক্ষমতাচূত পুত্র চালর্স লুইসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ব্যাভারিয়া এবং প্যালাটিনেট শাসকদ্বয়কে ইলেকটর উপাধি দেয়া হয়েছিল।

৮। বোহেমিয়ার সিংহাসনে পবিত্র রোমান সম্রাটের অধিকার স্বীকৃত হয়। অস্ট্রিয়ার উত্তরাংশ ব্যাভারিয়ার কাছে বন্ধক ছিলো অস্ট্রিয়া তা ফিরে পায়। ডিউক তার নিজ রাজ্যের উপর ইচ্ছামত ধর্মব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার লাভ করেন।

৯। স্যাক্সনি লুসেনিয়া এবং ম্যাগডেবার্গের একাংশ লাভ করলো।
এছাড়াও যে সকল অঞ্চল বা দেশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করেছিলো তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে ক্যালভিনপন্থীগণ লুথারপন্থীদের সমপর্যায়ে স্থাপিত হয়।

লুথারপন্থীরা যেসকল সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছিল তো ক্যালভিনপন্থীরা ভোগ করবেন বলে স্বীকৃত হয়।

১০। এই চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কোনো বিশপের অঞ্চল বা সিজারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। ১৬২৪ খ্রি:-১ জানুয়ারি তারিখে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের যেসব স্থানের অধিকার ছিলো সেই সব স্থান তারা ফিরে পাবে বলে স্থির হয়।

১১। পবিত্র রোমান সম্রাটের বিচারলয়ে সমান সংখ্যাক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাল্ট প্রতিনিধি বসার অনুমতি দেয়া হয়।

১২। কোন অঞ্চলের রাজা তার তাদের নিজ দেশের প্রজাদের ধর্ম নির্ধারণ করতে পারবেন। 'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম' এই নীতি অনুসরণ করা হলো। তবে বাস্তবিক অর্থে সমগ্র সাম্রাজ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি প্রচারিত হতে থাকে।

ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির ফলাফল

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ শান্তিচুক্তি। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রসুত ইতিহাসে সবচাইতে বীভৎস ধর্মদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটায় ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি। ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই সন্ধি এক দিকে ধ্বংসন্মুখ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতন স্বীকার করে নেয়, অপর দিকে ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করে। যদিও ধর্মীয় ইস্যুতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তথাপিও প্রোটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্রুত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী সময়ে হ্যাপসবার্গ এবং বুরবোঁ রাজবংশের প্রধান দ্বন্দ্বে বা আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে রুপান্তরিত হয়। এই শান্তিচুক্তি সকল চুক্তির বৈশিষ্ট্য বহন করায় পরবর্তীকালের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। এটি ইউরোপের জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫৫৫ সালের আর্গসবার্গের সন্ধি 'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম' এই নীতি ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি মাধ্যমে ক্যালভিনবাদকে লুথারাবাদীদের সমপর্যায়ে পুনরায় গ্রহণ করে। এর ফলে রাষ্ট্রে ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়।

তথাপিও স্বীকার করতে হবে যে, ক্যালভিনপন্থী এবং লুথারপন্থীগণকে সমপর্যায়ে স্থাপন এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে প্রভেদ দূর করে ধর্মকে প্রত্যেক রাজার নিজস্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে ওয়েস্টফেলিয়া সম্মেলনের সদস্যরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিদায় দিতে কিছুটা হলেও সক্ষম হন।

ওয়েস্টফেলিয়া যুদ্ধের দশবছর আগেই বোঝা যাচ্ছিল যে এটি ধর্মীয় প্রশ্নসমূহ থেকে সরে এসে রাজনৈতিক এবং বংশগত দ্বন্দ্বের ব্যাপারে ক্রমশ এগিয়ে আসতে থেকে। তৎকালীন শতাব্দীর উষালগ্নে এটি পরিষ্কার হতে থাকে যে ইউরোপের সকল স্থানে ধর্মীয় উন্মত্ততা ক্রমশ কমে

আসছিলো। ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তি ধর্মীয় ইস্যুসমূহকে পেছনে পাঠাতে এবং রাজনীতিকে সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই সন্ধি -

১। ইউরোপের রাজ বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে;

২। নিজ রাজ্য সীমা বিস্তৃত করে এবং

৩। কোন দেশই যাতে অধিকতর শক্তিশালী না হতে পারে তবে মৈত্রী, শান্তি ও সাম্য স্থাপন; এই তিন ওহফবহঃ এর উপর ভিত্তি করে সন্ধি হয়।

এই সন্ধি ধর্ম ও নৈতিক প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সত্তাকে সম্প র্ণভাবে বিনষ্ট করে, একদিকে তার কাঠামো যেমন ভেঙ্গে দিয়েছিলো অপরদিকে এটি ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। এ কারণে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধকে ইউরোপের ইতিহাসে সর্বশেষ ধর্ম সংক্রান্ত যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। এটি ইউরোপে সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথকে এই চুক্তি উন্মুক্ত করেছিলো।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হতে প্রায় তিনশত জার্মান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, নিজস্ব সেনাবাহিনী এবং নিজস্ব টাকশাল ছিলো। শুধু নামেই রোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিলো। পরবর্তী দুইশত বছর জার্মান রাজ্যগুলি দুর্বল রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতে থাকে। উত্তর জার্মানিতে প্রাশিয়া এবং দক্ষিণ জার্মানিতে ব্যাভারিয়া জার্মানির উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অস্ট্রিয়া হ্যাপসর্বার্গা রাজবংশ। তাদের যে আশা ছিল যে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নামে মধ্য ইউরোপে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবে তা হয়নি, অপরদিকে স্পেনের অর্থ সম্পদ নি:শেষ হয়ে এটি একটি দুর্বল দেশে পরিণত হয়।

অস্ট্রিয়ার ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফ্রান্স বুরর্বো রাজবংশের নেতৃত্বে ইউরোপের বৃহত্তর দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফ্রান্স পূর্বদিকে এ্যালসেস গ্রহণ করে জার্মান রাজ্যের দিকে হাত বাড়ানোর সুযোগ পায়। রাইন অঞ্চরে ফ্রান্সের প্রাধান্য অপ্রতিহত হয়ে উঠে।

বাল্টিক অঞ্চলেও ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়ার অন্যতম অংশ ব্রিটেন ও ভাদের্ন লাভ করার ফলে সুইডেন জার্মানিতে নিজ প্রধান্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করে ফলে সমগ্র উত্তর ইউরোপে সুইডেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এ ছাড়াও এই সন্ধির পর দানিয়ুব অঞ্চল নিয়ে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়া তুরস্কের অধীন স্থানগুলি দখল করার লক্ষ্যে যুদ্ধ শুরু করে। তবে এই চুক্তি স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান না ঘটিয়ে আরো এগারো বছর যুদ্ধ চলতে থাকে। সুতরাং দেখা যায় ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির ফলে নতুন কয়েকটি দেশের উত্থান এবং তাদের রাজ্য বিস্তারের আকাংক্ষা পরস্পর সহবস্থানের নীতির পরিবর্তে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব সূচিত হয়।

ওয়স্টেফেলিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং এই সময় থেকেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্ভব হয়েছিল। এই নীতির মূল আদর্শ ছিল ইউরোপের

শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ যেমন থাকবে তেমনি দুর্বল রাষ্ট্রসমূহও থাকবে। সকল দেশই একটি সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী হবে। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পর ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পরস্পর কূটনৈতিক যোগাযোগ, রীতিনীতি ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে একটি নতুন ইউরোপীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। সেই সময় থেকে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে স্থায়ী দূতাবাস গড়ে উঠে।

ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি শুধু রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম ক্ষমতাই প্রদান করেনি বরং এটি একটি দেশের সঙ্গে আরো একটি দেশের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলো আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি-আইন কানুন প্রণয়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই সময় থেকেই মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন লেখকরা নানা গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে হুগো গ্রসিয়াসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন ডাচ মানবতাবাদী কর্মী, যিনি হল্যান্ডে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে কাজ করেন।

হুগোগসিয়াসের সন্ধি বিষয়ক 'De Jure Belli de Piacis' আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে লেখা একটি গ্রন্থ। এটি মানুষকে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব বুঝাতে সক্ষম হয়। আন্তার্জাতিক আইন কোন নিরপেক্ষ দেশকে নিশ্চয়তা দেবে এবং বিপুল প্রাণহানি সম্পত্তি ধ্বংসবিশেষ থেকে রোধ করবে সে সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ বা যুদ্ধে যারা অংশ নেয়নি তাদের নিরাপত্তার জন্য জ্ঞানীগুনি ব্যক্তিবর্গ নিয়মনীতি প্রণয়ন করার কথা বলেন। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তৎকালীন মানুষের মানবতা বোধকে জাগ্রত করে, যুদ্ধে অসুস্থ এবং আহতদের শুশ্রুষা এবং লুণ্ঠনকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি ক্রমশ বাড়তে থাকে। হুগো এই বইতে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

এরপর থেকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা একটি গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে গড়ে উঠে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে সমগ্র ইউরোপ কেঁদে উঠে। প্রতিটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ব্যক্তি বা জীব হত্যাকে ধর্ম বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা দেয়। প্রত্যেকে নিজের এবং অন্যের ধর্মকে আলাদা ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে সম্মান দিতে শুরু করে এবং এটি একটি প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়। মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ এই সময়েই বিস্তার লাভ করতে থাকে।

এ ভাবে নানা দিক দিয়ে বিচার করলে ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধি একটি যুগের অবসান ঘটিয়ে অপর এক নুতন যুগের আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল মৃতদেহ থেকে এক নতুন ইউরোপীয় সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে। নুতন শক্তির উত্থান এবং তাদের পারস্পরিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইউরোপের এক নুতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধি চুক্তির পর ১৬৫৯ সালে ফ্রান্স ও স্পেন পিরেনিজে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। স্পেনের একচ্ছত্র আধিপত্যের শেষ পদচিহ্ন মুছে ফেলে। ওয়েস্টফেলিয়ার তৃতীয় চুক্তি হিসাবে ওলিভ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৬৬০)। ব্রানডেনবার্গ, সুইডেন এবং পোল্যান্ডের মধ্যে বাল্টিক অঞ্চলে শান্তিচুক্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এভাবে ওয়েস্টফেলিয়া এবং পরবর্তীতে পিরেনিজে এবং ওলিভ চুক্তি ইউরোপে শান্তির নুতন দিগন্তের সূচনা করে।

ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল

ইউরোপের ইতিহাসে সবচাইতে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হিসাবে ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই যুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সামাজিক, নৈতিক, অনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে এই যুদ্ধের পর একটি ছায়ামূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ করার বদলে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি জার্মানিকে তিনশত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক শাসক তাদের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি এবং আলাদা প্রতিরক্ষা ও শুল্ক নীতি গ্রহণ করে। এই সব রাষ্ট্রের উপর সম্রাটের প্রভাব কমে যাওয়ায় সাম্রাজ্য দুর্বল, ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এর ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে উত্তর-জার্মানিতে ব্রানডেনবার্গ প্রাশিয়ার উত্থান ঘটে এবং অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। জার্মানি উনিশ শতকে বিসমার্কের নেতৃত্বে একত্রীকরণ ও শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জার্মানির উত্থানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যেক যুদ্ধের ফলেই কতক দু:খ দুর্দশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের ইতিহাসে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের দু:খ দুর্দশার কোনো তুলনা চলে না। জার্মানির খুব কম অঞ্চলই ছিলই যেখানে এই যুদ্ধ স্পর্শ করে নাই। এই যুদ্ধে এটিই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের নিষ্ঠুরতাই নির্মমতার কাছে মানুষের জীবন মূল্যহীন। সৈনিকদের অত্যাচার ধর্মযুদ্ধের উন্মত্ততা ও অবাধ হত্যাকান্ডে জার্মানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রামের গ্রাম মানুষ জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয়। জার্মানির বহু অংশের জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে। জার্মানির দুই তৃতীয়াংশ লোক নিহত হয়, বহু গ্রাম জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ১৬০২ সালে জনসংখ্যা যেখানে ছিলো একুশ হাজার ১৬৪৮ সালে তা দশ হাজারে নেমে আসে। কৃষকের জমি বন্ধ্যা জমিতে পরিণত হয়। সৈন্যবাহিনী প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

দৈহিক উৎপীড়নের সঙ্গে নৈতিকাতর সম্পুর্ণ পতন ঘটবার ফলে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশই এক একটি পশু শক্তিতে পরিণত হয়। যুদ্ধের শেষপর্যায়ে একমাত্র ফ্রান্স ভিন্ন অপরাপর সকল দেশেই গভীর হতাশা ও অবসন্নতা দেখা দিয়েছিলো। অনেক লোকই যুদ্ধেরপর নি:শোষিত হয় এবং তারা খুন-খারাপী ও ডাকাতিতে অংশ নেয়। দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার বদলে মানুষ নির্মম পশুতে পরিণত হয়। মানুষের অভ্যাস, রীতি-নীতি নৈতিকতার বিরোধী হতে থাকে। স্কুল-কলেজ- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশ কুসংস্কারে ছেয়ে যায়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এই যুদ্ধের চরম দুর্দশা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান শহরগুলি মধ্যে যেগুলো ছিলো খুবই সমৃদ্ধশালী সেগুলো এই ধ্বংশযজ্ঞে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে উত্তর জার্মানির দেশগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যাপক খাদ্যভাবে জার্মানির বহু স্থানের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্য ভাবে মানুষকে তৃণভোজী হতে বাধ্য করেছিলো। অতিরিক্ত খাজনার চাপে তারা দাসে পরিণত হয়। এছাড়াও যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ

হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ ফরাসি এবং ডাচদের হাতে চলে আসে। শিল্পক্ষেত্রে জার্মানির অধপতন যুদ্ধের পর আরো বেড়ে যায়। জার্মানির ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র হ্যানসান শহর, লিপজিগে, ম্যাগডেবার্গ, হামবুর্গ এবং অন্যান্য শহর ঘুমন্ত শহরে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কিরা ভেনিসের বাণিজ্য দখল করে এবং পরবর্তী কালে ইংল্যান্ড হল্যান্ড তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশ্ববাণিজ্য ক্রমশ অধিকার করে নেয়। সুতরাং বাণিজ্য ক্ষেত্রে জার্মানির পতন ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে চূড়ান্তরূপ ধারণ করে।

যুদ্ধে জার্মানির শিল্প, সাহিত্য অর্থনীতি, কৃষি এবং বাণিজ্যের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি ইতালি এবং ফ্রান্সের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শতধাবিভক্ত জার্মানির সৃজনীশক্তি, সৃষ্টিশীলতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। জার্মান ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন ক্রমশ নিম্নমুখী হতে শুরু করে, তেমনী জার্মানির বুদ্ধিজীবী জ্ঞানবিদগ্ধ জনও ক্রম হ্রাস পেতে শুরু করে। ফ্রান্স ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির পর শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করলেও জার্মানির এই অধ:পতন হতে পুনরুদ্ধার করতে সময় লাগে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল নি:সন্দেহে ধ্বংসাত্মক। অনিশ্চিয়তা অস্থিরতা জার্মানিকে ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং জড়াগ্রস্ত করে তোলে। তাদের জাতীয় নীতি, ঐতিহ্য, কৌশল ভীতিজনিত অবস্থার মধ্যে পড়ে। সব হারিয়ে জার্মানি হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। তবে এর মধ্যে জার্মানি আবার ক্রমশ চেতন হতে শুরু করে। তাদের দু:খ দুর্দশা অভাব গ্রস্ততা পরবর্তী কালে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি করে এবং জার্মানি ক্রমশ একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। সুতরাং প্রাগের ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল পরবর্তীকালে সেই ধ্বংসস্তুপকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক জার্মানির উত্থানের পথ প্রশস্ত করে।

সারসংক্ষেপ

ত্রিশবছরব্যাপী অবিরামভাবে যুদ্ধ করার পর ঘটে ক্লান্ত বিপর্যস্ত ইউরোপ ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টাফেলিয়া চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটায়। এই চুক্তি ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায় এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতির গোড়াপত্তন ঘটায়। পূর্বে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হবার আর্দশে বিশ্বাসী ছিল তবে এই যুদ্ধের ফলে সেই কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিযে দ্রুত ইউরোপে রাজরা তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন দ্বন্দ্ব শুরু করেন। জার্মানি তথা ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব ছিলো ভয়াবহ। সমগ্র জার্মানি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। রোমান সাম্রাজ্যের ছায়ামূর্তিতে পুরাতন রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠে। তবে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির পর সর্বপ্রথম নতুন ইউরোপীয় ব্যবস্থার লক্ষ্যে স্থায়ী কূটনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এই চুক্তির ফলস্বরূপ রাষ্ট্রসমুহের আন্তর্জাতিক প্রথা বা রীতি-এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত প্রেরণ করে যুদ্ধে নিরাপরাধ বা নিরপেক্ষ মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্রমশ স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের আদান-প্রদান এবং কূটনীতির রীতি-নীতি এই চুক্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন সম্রাট ত্রিশব্যাপী যুদ্ধের পর শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করেন?

ক) প্রথম ফার্দিনান্দ খ) প্রথম রুডলফ
গ) দ্বিতীয় ফিলিপ ঘ) তৃতীয় ফার্দিনান্দ

২। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির ফলে জার্মানিতে কি পরিবর্তন আসে?

ক) ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠিত হয়
খ) জার্মানিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত করা
গ) জার্মানির প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়
ঘ) জার্মানিকে কতগুলি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসা হয়

৩। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিতে সবচাইতে বেশি অর্জন ছিল কার ?

ক) ইংল্যান্ডের খ) রাশিয়ার
গ) ফ্রান্সের ঘ) অস্ট্রিয়ার

৪। কার সিংহাসনের উপর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়?

ক) বোহেমিয়া খ) ব্যাভারিয়া
গ) স্যাক্সনি ঘ) প্যালাটিনেট

৫। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পর ক্যালভিনপন্থীদের কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়?

ক) ক্যালভিনপন্থীদের লুথারপন্থীদের সমপর্যায়ে অধিষ্ঠিত করা হয়
খ) ক্যালভিনপন্থীদের লুথারপন্থীদের অধ:স্তন করা হয়
গ) ক্যালভিনপন্থীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়
ঘ) ক্যালভিনপন্থীদের লুথারপন্থীদের চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়

৬। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি কোন ধর্মীয় নীতিকে অনুসরণ করে?

ক) 'প্রজার ধর্মই রাজার ধর্ম' খ) 'রোমের ধর্মই সকল ইউরোপের ধর্ম
গ) সহিষ্ণুতাই প্রজার ধর্ম ঘ) 'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম'

৭। আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের সর্ব প্রথম গ্রন্থ লেখেন কে?

ক) হুগো গ্রসিয়াস খ) এ্যারাসমাস
গ) পিরেনীজ ঘ) ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি

৮। স্পেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পন্ন হয়?

ক) বার্লিন খ) অলিভ
গ) পিরেনিজ ঘ) ওয়েস্টফেলিযার চুক্তি

উত্তর : ১। (ঘ), ২। (গ), ৩। (গ), ৪। (খ), ৫। (ক), ৬। (ঘ), ৭। (ক), ৮। (গ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২। গুগো গ্রসিয়াস কে ছিলেন ? যুদ্ধের নৃশংসতারোধে তিনি তার গ্রন্থে কি বক্তব্য লিখেন।
৩। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের ফলে জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির মূল শর্ত গুলি আলোচনা করুন।
২। ইউরোপের ইতিহাসে ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির প্রভাব বর্ণনা করুন। কিভাবে ইউরোপে এটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি করে?
৩। ইউরোপে তথা জার্মানির উপর ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization, Vol II, From 1600 to the Present
২। J.S. Swain, A History of World Civilization.
৩। Carlton J. H. Hayes, Modern Europe to 1870
৩। B. V. Rao, History of Europe (1450 - 1815)
৪। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)।